নারী তুমি বিদ্রোহ করো

-- অনন্ত --

১৯ এপ্রিল ২০০৬

এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি অদেখা বন্ধু সামিন নওয়ার কাশমিকে উৎসর্গীকৃত।

নারী, নারী স্বাধীনতা, নারীবাদ, নারীদিবস পালনের অপরিহার্যতা ইত্যাদি নিয়ে আমার কোনো পরিপূর্ণ ধারণা সেই দিনও পর্যন্ত ছিলো না (এখন যে পূর্ণ হয়েছে তাও দাবি করি না)। আমি ছোটবেলা থেকেই মফস্বলে থাকি, মফস্বলের পুরুষশাসিত সমাজের ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গী আমার অন্তরে অন্তর্স্থ। তাই আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা নির্যাতিত, নারীরা অবদমিত- এ বোধ কখনও জাগে নি। বরং সত্যি বলতে যখনই নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর স্বাধীনতা, নারী দিবস পালনের কথা শুনেছি, আমার ভিতর কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পুরুষতান্ত্রিক রক্ষনশীল মনমানসিকতা আমার রক্তে সদা বহমান। আমার মনে হতো, নারীর আবার অধিকার কী, তারা কি পরাধীন এ সমাজে, কই তাদের পায়ে তো শিকল বাঁধা নেই!!

কিছুদিন আগে আমাদের ইয়াহু আলোচনাচক্র " আমরা নাস্তিক "-এ সাতরং অন্তর্জালের পরিচালক শ্রদ্ধেয় নন্দিনী হোসেন কথা প্রসংগে বলেছিলেন, পুরুষ + নারীবাদী = ঘোড়ার আন্ডা। নন্দিনী হোসেনের এ বক্তব্য বেশ তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো। কেউ কেউ তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন, আবার কেউ কেউ না। আমিও তখন আমার তথাকথিত পুরুষতন্ত্র রক্ষার জন্য মানবতাবাদের দোহাই দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। শেষে কথা প্রসংগে লিখলাম, নারীবাদী পুরুষরা যদি ঘোড়ার আন্ডা হয় তবে নারী + পুরুষবাদী = ??। আসলে আমার বক্তব্যে যতটা না ছিলো মানবতাবাদের দোহাই, তার থেকে বেশি ছিল দুর্গন্ধযুক্ত পঁচাগলা পুঁজেভরা পিতৃতন্ত্রের সরস উপস্থিতি!

সারা বিশ্বেই সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল (মূলতঃ কৃষিভিত্তিক সভ্যতা শুরু হওয়ার পর থেকে) থেকে নারীরা সামাজিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে, উপাসনাধর্মীয় জিগির দিয়ে কিংবা সরাসরি শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছেন। অবদমিত করে রাখা হয়েছে তাদের উৎপাদন প্রকৃয়া থেকে। উৎপাদিত পণ্যের ভোগ বা বন্টন থেকে তারা বঞ্চিত। অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রকৃয়া থেকে আজও তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য নানা ধরণের তত্ত্ব- উপাত্ত আমদানি করে থাকেন আমাদের ভাগ্যবিধাতারা। তাঁদের এসকল তত্ত্ব-উপাত্ত আমরা অমৃতভেবে গলধঃকরণ করি, তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে পায়ের উপর পা তুলে ভাবি, "অবলার আবার সমানাধিকার!! খেঁক! খেঁক!"

আজকের এই কিস্তিতে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু '**প্রথাগত সত্য**'-কে সংশ্লেষন-বিশ্লেষন করে দেখা হলো। দেখা যাক, কী ফলাফল বের হয়ে আসে?

* * * * * * * * * * *

বাঙলা ভাষায় "নারী' শব্দের যে সকল সমার্থক শব্দ আছে, তার বেশীরভাগই নঞ্চার্থক অর্থে ব্যবহৃত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মহিলা ("মহল' শব্দ থেকে আগত), অবলা (শক্তিহীন)। আবার কিছু শব্দের ভাবে কামক্ষুধার (যৌনতার) তীব্রদাগ স্পষ্ট। যেমন : স্ত্রী, রমণী, ললনা, অঙ্গনা, কামিনী, বনিতা, বামা, নিতম্বিনী, সুন্দরী ইত্যাদি। আবার "মেয়েছেলে', "মেয়েলোক', "মেয়েমানুষ' দ্বারা বোঝায় স্ত্রীলিঙ্গ জীব। অর্থাৎ সুদীর্ঘসময়ে পিতৃতন্ত্র "নারী' সম্পর্কিত যে ধ্যান-ধারণা কিংবা ভাবমূর্তি তৈরি করেছে, তার বে'শ গভীর ছায়া পড়েছে বাঙলা ভাষায়। আর আমরাও ব্যবহার করে চলছি জেনে হোক আর না জেনেই হোক।

জানি না, ইংরেজীতে উচ্চারিত '**woman**' শব্দটি '**woeman**' শব্দ থেকে এসেছে কি না??

আমরা সাধারণত পুরুষ অর্থে বুঝে থাকি, "স্বামী' (প্রভু) "নর', "মনুষ্য', "ঈশ্বর', "পরমব্রহ্ম' ইত্যাদি। আবার "**পুরুষত্ব**' বলতে বুঝি - পৌরুষ, উদ্যম, তেজ, শক্তি ইত্যাদি। এবং "**নারীত্ব**' হচ্ছে - সতীত্ব, মমতা, বাৎসল্য, স্নেহপরায়না, সন্তান লালন-পালন ইত্যাদি। "পুরুষ' শব্দটি দিয়ে যদি প্রকাশ পায় কঠোরতা, তবে "নারী' শব্দ দিয়ে প্রকাশ পায় কমনীয়তা। "পুরুষ' যদি হয় বহির্মুখী, তবে "নারী' হবে

অন্তর্মুখী। মনে হচ্ছে "পুরুষ' ও "নারী' শব্দগুলি নির্দেশ করে দ্বিমুখী বৈপীরত্য।

এই দ্বিমুখী বৈপীরত্যের রূপ প্রবলভাবে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় বাঙলা ভাষায় (অন্যান্য ভাষায়ও কম বেশি আছে)। আমাদের ভাষাপন্ডিতেরা সুদীর্ঘসময়ের প্রচেষ্টায় তা প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। ভাষাগত পার্থক্য বাদ রেখে এখন তাহলে দেখা যাক; একজন নারী-পুরুষের শরীরতাত্ত্বিক পার্থক্য কী কী? এ ব্যাপারে একটু বিস্তারিতই আলোচনা করা হলো -

মানুষ (নারী-পুরুষ) উদ্ভুত হয় যৌন সঙ্গমের ফলে নিষিক্ত একটি কোষ থেকে (১)। ওই কোষটি বা ডিম্বাণুটি (Ovum, egg-cell) উর্বর হওয়ার সাথে সাথে বিশ্লিষ্ট হয় দুটি অভিন্ন কোষে; ওই কোষদুটি আবার বিশ্লিষ্ট হয়ে সৃষ্টি করে চারটি অভিন্ন কোষ। এভাবে এগুলো বার বার বিশ্লিষ্ট হয় এবং সৃষ্টি করতে থাকে অসংখ্য নতুন কোষ। এই প্রকৃয়া যেমন ঘটে পুরুষের বেলায় তেমনি নারীর বেলায়ও। ভাঙতে ভাঙতে আর গড়তে গড়তে কোষ গুচ্ছ তৈরি করে "কলা' বা Tissue আবার কলাগুচ্ছ তৈরি করে অঙ্গ বা Organ সমূহ। এভাবে কোনো কোষগুচ্ছ তৈরি করে কংকাল, কোনোগুচ্ছ তৈরি করে পেশি, কোনো গুচ্ছ তৈরি করে রক্তনালী ও হৃৎপিন্ড। আবার কোনো গুচ্ছ তৈরি করে রক্তের লাল রক্তকণিকা, কোনো গুচ্ছ তৈরি করে অনুচক্রিকা, কোনো গুচ্ছ তৈরি করে শ্বেতরক্তকণিকা। একগুচ্ছ কোষ বহুগুণে বেড়ে তৈরি করে মস্তিষ্কের কোষ ও স্নায়ুতন্ত্রি। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এসবই কোষ তৈরি হয় মাত্র একটি গর্ভবতী ডিম্বানু থেকে (একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহ ৫০ মিলিয়ন মিলিয়ন কোষ নিয়ে গঠিত)। এ'সব কোষের প্রত্যেকটি ধারণ করে অজস্র তথ্য। এসব তথ্যের অর্ধেক আসে পুরুষের কাছ থেকে, সে শুক্রাণুটির (Spermatozoon) মধ্য দিয়ে যেটিকে গর্ভবতী করেছে ডিম্বাণুটিকে; এবং বাকি অর্ধেক আসে নারীর কাছ থেকে ওই ডিম্বাণুটি (Ovum)-র মধ্য দিয়েই। কোষটিকে কোথায় কী কাজ করতে হবে, সে ধরণের নির্দেশ দেয়া থাকে প্রত্যকেটি কোষের কেন্দ্রস্থিত একধরণের পাকানো বস্তুতে। যাকে আমরা ক্রোমোসোম (Chromosome) বলি। এই ক্রোমোসোম আবার গঠিত কয়েক কোটি গুটিকার দীর্ঘ মালায়। এগুলোর নাম জিন (Gene)। জিন হচ্ছে ক্রোমোসোম-এ রক্ষিত তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক। জিন গঠিত হয় ডিন এন এ (DNA ; Deoxyribonucleic Acid)-এর পাকানো তন্ত্রিতে। কোনো একটি কোষে কাজ করে বা সক্রিয় থাকে মাত্র গুটিকয়েক জিন, আর বাকি জিনগুলো থাকে নিস্ক্রিয়।

মানবশরীরের প্রতিটি কোষে থাকে ৪৬টি ক্রোমোসোম; তবে এর ব্যতিক্রম দুটি কোষ ; একটি নারীদেহের ডিম্বাণু এবং অন্যটি পুরুষদেহের শুক্রাণু। ৪৬টি ক্রোমোসোমের মধ্যে ৪৪টি ক্রোমোসোম নিয়ন্ত্রন করে মানুষের সমস্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও কাজকর্ম। অর্থাৎ একজন মানুষের গায়ের রং কী হবে, উচ্চতা কতটুকু হবে, তার চরিত্র কীধরণের হবে ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন করে থাকে। এই ৪৪টি ক্রোমোসোমেকে "অটোসোম' নামে আখ্যায়িত করা হয়। বাকি দুটি ক্রোমোসোম (ডিম্বাণু ও শুক্রাণু) স্থির করে লিঙ্গ (অর্থাৎ সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে), এদুটিকে লিঙ্গ ক্রোমোসোম (Sex Chromosome) বলে থাকে। দুটি লিঙ্গ ক্রোমোসোমের একটিকে বলা হয় X লিঙ্গ ক্রোমোসোম এবং অন্যটিকে বলা হয় Y লিঙ্গ ক্রোমোসোম। নারীশরীরের কোটি কোটি কোষের প্রত্যেকটিতে রয়েছে ৪৪টি অটোসোম এবং ২টি X ক্রোমোসোম এবং পুরুষের শরীরের প্রত্যেক কোষে রয়েছে ৪৪টি অটোসোম এবং ১টি X ক্রোমোসোম ও Y ক্রোমোসোম। তাহলে বলা যায়, নারী হচ্ছে ৪৪টি অটোসোম ও XX ক্রোমোসোমের এর সন্নিবেশ; পুরুষ হচ্ছে ৪৪টি অটোসোম ও XY ক্রোমোসোমের সন্নিবেশ। **পুরুষ তার শরীরের কোটি কোটি কোষের প্রত্যেকটির মাধ্যমে পৃথক থাকে নারী থেকে, কেননা পুরুষের রয়েছে ১টি Y ক্রোমোসোম, যা নারীর শরীরে নেই। জন্মের সময় থেকেই নারী-পুরুষের পার্থক্য সূচিত হয় এই একটি লিঙ্গ ক্রোমোসোমের মাধ্যমে**।

আগেই বলা হয়েছে নারী-পুরুষের শরীরে প্রত্যেকটি কোষেই রয়েছে ৪৬টি ক্রোমোসোম তবে শুধু ব্যতিক্রম নারীর ডিম্বাণু এবং পুরুষের শুক্রাণু। এ দুটিতে ৪৬টি ক্রোমোসোম নেই, আছে ২৩টি ক্রোমোসোম। পরবর্তীতে নিষিক্ত হওয়ার সময় ডিম্বাণু ও শুক্রাণু থেকে ২৩ টি করে ৪৬টি ক্রোমোসম মিলিত হয়। পুরুষ নারী থেকে ভিন্ন শুধু ১টি Y ক্রোমোসোমের জন্য; এই ক্রোমোসোম ঠিক করে সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে। যখন কোনো Y ক্রোমোসোমবাহী শুক্রাণু উর্বর বা গর্ভবতী করে কোনো ডিম্বাণুকে। তখন এটি শুধু ওই ডিম্বাণুর স্ত্রীলিঙ্গতা কমিয়ে দেয়, তাই সন্তানটি ছেলে হয়ে উঠে। পূর্বে আমাদের সমাজে প্রথাগত ধারণা ছিলো নারীর সাথে কিছু যোগ করলে পুরুষ হয়ে উঠে; আসলে মূল তথ্য হচ্ছে নারী থেকে কিছু বাদ দিলে পুরুষ হয়ে উঠে। আবার **পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার Y ক্রোমোসোমের উপস্থিতির কারণে গর্ব করে থাকে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে ভিন্ন কথা। এই ক্রোমোসোম কিছু ব্যাধির বিকাশ ঘটায়, অপরাধীমূলক মনমানসিকতা বিকাশে ও এর অবদান লক্ষ্যনীয়। বড় বড় অপরাধীদের অনেকের রয়েছে একটি অতিরিক্ত Y ক্রোমোসম, তারা XYY। অপরাধের সাথে এই Y ক্রোমোসোমের মৌল সম্পর্ক রয়েছে বলে আজকের অপরাধ বিজ্ঞানীরা সন্দেহ প্রকাশ করতেছেন।**

ডিম্বাণু উর্বর হওয়ার প্রায় বিশ দিন পর ভ্রূণের অন্ত্রের রন্ধ্রের দেয়ালে এক রকম এক কোষ দেখা যায়। তারপর এ-কোষগুলো তন্ত্রির ভেতর দিয়ে চলে যায় অন্ত্রের রন্ধ্রের দু দিকে অবস্থিত নিচু পুরু এলাকায়। এ- তন্ত্রি থেকে সৃষ্টি হয় ডিম্বাশয় (Ovary)। গর্ভধারণের তিরশ দিন পরে এ কোষগুলো ওই তন্ত্রিতে স্থির হয়ে বসে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে। একে বলা হয় গোনাড (Gonad)। গর্ভাধারণের ১৪০ দিন পরে এই গোনাডে প্রায় ৭০ লক্ষ কোষের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এগুলোর অনেকে ঢাকা থাকে আবরণে। আবরণের ভেতরে এগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং অনেক কোষের মধ্যে দেখা যায় তরল বস্তু। এগুলোকে ডিম্বাণু বলে। যে কোষগুলোতে তরল বস্তু দেখা যায়, সেগুলোকে বলে আধার বা ফলিকল। যে কোষগুলোর আবরণ থাকে না, সুগুলো পরবর্তীতে নষ্ট হয়ে যায়, এবং জন্মের সময়ে প্রায় ২০ লাখ ডিম্বাণু অবশিষ্ট থাকে। এরপরও নষ্ট হয় বহু ডিম্বাণু। বয়ঃসন্ধির সময় অবশিষ্ট থাকে ২ লাখের মতো ডিম্বাণু। নারীর ঋতুস্রাবের সূচনা থেকে ঋতুবন্ধ হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে ১২ থেকে ২০টির মতো ডিম্বাণু বিকশিত হয় এবং সবচেয়ে যেটি বিকশিত হয় সেটি বের হয়ে আসে ডিম্বাশয় থেকে। এটি পরিপক্ক ডিম্ব পরবর্তীতে এটি গর্ভবতী বা নিষিক্ত হতে পারে। মাঝে মাঝে একাধিক ডিম্বাণু বের হয়ে আসে, যার ফলে একাধিক সন্তান জন্মে (যমজ সন্তান)। ডিম্বাশয়ে বৃদ্ধির সময় প্রতিটি ডিম্বাণু ভেঙে সৃষ্টি হয় দুটি কন্যা ডিম্বাণু; এদুটির একটি বড় এবং অন্যটি ছোটো। প্রতিটি ডিম্বাণুতে থাকে ২৩টি ক্রোমোসোম : ২২টি অটোসোম এবং ১টি X ক্রোমোসোম। নিষিক্তির সময় বড় ডিম্বাণুটি শুক্রাণুর মাথাকে নিজের ভেতর টেনে নিয়ে যায়; সৃষ্টি করে সন্তান। ছোটটি ডিম্বাণুটি কোনো কাজ করে না।

যখন একটি শুক্রাণু উর্বর করে একটি ডিম্বাণুকে তখন নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। যৌনসঙ্গমের ফলে নারীর যোনিতে স্খলিত হয় কোটি কোটি শুক্রাণু, তার মধ্যে কয়েক হাজার পৌঁছতে পারে জরায়ুতে। বাকি গুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যে কয়েকশো ঢুকতে পারে ডিম্বনালিতে, এবং তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ডিম্বনালি দিয়ে সাঁতরে এগোতে পারে ডিম্বাণুর দিকে। এই কয়েকটির মধ্যে আবার একটি মাত্র শুক্রাণু ডিম্বাণুর শক্ত উজ্জ্বল আবরণ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারে। শুক্রাণু তার মাথা আবরণের ভিতর ঢুকানোর পর আবরণের গায়ে আটকে থাকে শুক্রাণুর মধ্যভাগ এবং লেজ। একসময় এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। যেই কোনো শুক্রাণু ঢুকে পড়ে ডিম্বাণুর শক্ত আবরণ ভেদ করে, অমনি এমনভাবে বদলে যায় আবরণটি, যাতে অন্য কোনো শুক্রাণু আর না ঢুকতে পারে। যখন ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর ক্রোমোসোম পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, সূচনা হয় নতুন জীবনের। জীনের নিয়ন্ত্রনে তখন কোষটি বার বার ভেঙে ভেঙে সৃষ্টি করে নতুন মানব। শুক্রাণুর মাথা ডিম্বাণুর ভেতর

এসে ভেঙে পড়ে এবং বেরিয়ে আসে ক্রোমোসোমগুলো, একই সাথে ডিম্বাণুরও ক্রোমোসোমগুলোও বেরিয়ে আসে। এরফলে নারীর ২৩টি ক্রোমোসোম এবং পুরুষের ২৩টি ক্রোমোসোম সম্মিলিত হয় পরস্পরের সাথে, তখন ক্রোমোসোমের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬টি। এভাবে মানব দেহের প্রতিটি কোষে থাকে ৪৬টি ক্রোমোসোম।

সন্তান জন্মের ব্যাপারে পিতার ক্রোমোসোমই নিয়ন্ত্রন করে সন্তানের লিঙ্গ (XX হলে নারী আর XY হলে পুরুষ)। যদিও তার কোন ধরনের শুক্রাণু গর্ভবতী করবে ডিম্বাণুকে, তা নিয়ন্ত্রণের শক্তি নেই তার। আবার সন্তানের লিঙ্গ X ক্রোমোসোমের উপস্থিতির ফলে স্ত্রীলিঙ্গ হয় না বরং স্ত্রীলিঙ্গ হয় Y ক্রোমোসোমের অনুপস্থিতির ফলে। ভ্রুণ ডিম্বাশয়ে বিকশিত হতে সময় লাগে সাত সপ্তাহের মতো। এসময় ভ্রুণ স্ত্রীও নয় আবার পুরুষও নয়। কিংবা বলতে গেলে স্ত্রী বলা যেতে পারে, কেননা Y ক্রোমোসোমের উপস্থিতিতে গোনাড অন্ডকোষয়ে পরিণত হয়, আর উপস্থিত না থাকলে যা ছিলো তাই থেকে যায় অর্থাৎ বিকাশ ঘটে ডিম্বাশয়ের। তাই বলতে হয় নারী পুরুষ উভয়েরই সূচনা ঘটে নারীরূপে। সপ্তম সপ্তাহে এসে কোনো কোনো ভ্রুণ পুরুষ হয়ে উঠে। নারী হচ্ছে শুরু থেকে নারী আর পুরুষ হচ্ছে প্রথমে নারী তারপর পুরুষ।

নারীপুরুষের মধ্যে ভিন্নতার চেয়ে অভিন্নতাই বেশি, তবে ভিন্নতা যে নেই এমন নয়। যেমন ঃ পুরুষের রয়েছে শিশ্ন

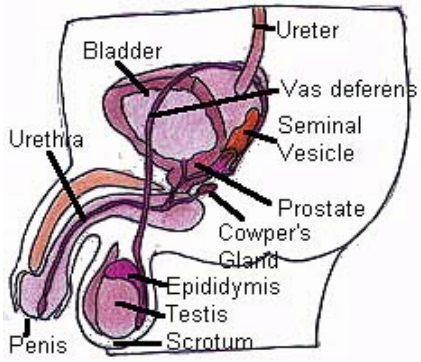

(Penis), অন্ডকোষ (Testicle), শুক্রাশয় (Seminal Vesicle) সহ অন্যান্য। এবং নারীর রয়েছে ভগাঙ্কুর (Clitoris),

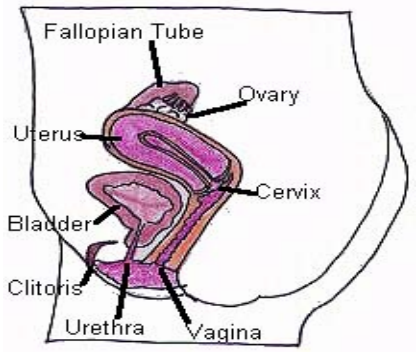

যোনিচ্ছদ (Hymen), যোনি (Vagina), জরায়ু (Uterus), উঁচু স্তনযুগল (Breast), ডিম্বাশয় (Ovary), ডিম্বনালী (Fallopian Tube) সহ আরো কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। উপরের চিত্রদ্বয়ে মানব শরীরের তথাকথিত গোপন অংশের কিছু অংশ অঙ্কিত (২)। কিন্তু শুধুমাত্র এই শরীরগত ভিন্নতার কারণে পুরুষ হয়ে উঠবে আধিপত্যকারী এবং নারী হবে অধীন, এটা কখনোই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। বাস্তবে পুরুষতন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র, যাই বলি না কে'ন নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্য থেকে সংস্কৃতিগত পার্থক্য গড়ে তুলেছে প্রধান। আমাদের সমাজ সংস্কৃতিতে জৈবিক নারীকে এমনভাবে

দীক্ষা দেয়া হয় সেই জন্মের পর থেকেই যাতে তাদের মধ্যে নারীত্ব বা নারীধর্মই প্রবলভাবে বিকাশ লাভ করে। এই নারীত্ব বা নারীধর্মকে সোজা ভাষায় বলা যায় ""**পুরুষের (পিতা, ভাই, স্বামী) আজ্ঞাবাহী সদাসেবায় নিয়োজিত এক জীব**"। কিন্তু এই নারীধর্ম বা নারীত্ব বলতে যা বুঝি তার সাথে জৈবিক লিঙ্গ পার্থক্যের বিশেষ সম্পর্ক নেই। তবু আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও নারীকে মানুষ বলে ভাবতে শেখেনি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পিতৃতন্ত্রের গর্বিত উত্তরাধিকার কবিগুরু (!) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কলি, ""**শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!/ পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি।**" নারী, নারীর শরীর নিয়ে এই একবিংশ শতাব্দিতে রয়েছে নানা কুসংস্কার, ঘৃণা আর অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গী। আদিমকাল থেকেই চলে আসছে নানা কুসংস্কারের ফলগুধারা। যা আজকের বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উৎকর্ষতার যুগে এসেও বেশিরভাগ মানুষ মেনে নেয় বিনা প্রশ্নে, বিনা যুক্তিতে। সেই অনেক কাল আগে (১৯৪৮) বিখ্যাত নারীবাদী সিমোন দ্য বোভোয়ার (**দ্বিতীয় লিঙ্গ** গ্রন্থে) বলেছিলেন, ""**কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং হয়ে উঠে নারী। সমাজে যে নারী দেখা যায়, কোনো জৈব, মনস্তাত্ত্বিক বা অর্থনীতিক ভাগ্য তার রূপ স্থির করে না; সমগ্র সভ্যতাই উৎপাদন করে পুরুষ ও খোজার মাঝামাঝি এ প্রাণীটিকে, যাকে বলা হয় নারী**"।

নারী-পুরুষের মধ্যে যেসব জৈবিক পার্থক্য রয়েছে জীববিজ্ঞানের ভাষায় বলে, ""যৌনতা ভিত্তিক দ্বিরূপতা" (Sexual Dimorphism) (৩)। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই দ্বিরূপতার সবচেয়ে প্রকটিত দিক হচ্ছে দৈহিক কাঠামো এবং মাংস পেশির গঠন। হাড় ও মাংস আমাদের শরীরের অবিচ্ছেদ্য এবং পরস্পর সম্পর্কিত দু'টি অংশ যা আমাদের কাঠামো বা অবয়ব সৃষ্টি করে। একই বর্ণের (Race)এর মানুষের মধ্যে পুরুষেরা কাঠামো এবং পেশিময়তার দিকে দিয়ে নারীদের থেকে এগিয়ে থাকে। অর্থাৎ পুরুষের কাঠামো নারীদের চেয়ে বড় ও পেশিবহুল হয়।

আমাদের সমাজে একটি প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত ধারণা হচ্ছে মাংসপেশি এবং দেহকাঠামোর পার্থক্যের কারণেই শক্তিমত্তা, উদ্যম, স্পৃহা, দক্ষতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে? দৈহিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই পুরুষ মানব সমাজের ""**মূল চালিকা শক্তি**"। এই ধারণাটি অনেকাংশেই সরলীকৃত যদিও প্রকৃত সত্য এতো সরল নয়, কিছুটা জটিল এবং বহুমাত্রিক।

জৈবিক পার্থক্য এবং পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটের দ্বন্দ্বের কারণে নর-নারীর সামাজিক অবস্থান তৈরি হয়েছে। কাঠামো এবং মাংসপেশির পার্থক্য যেহেতু নারী-পুরুষের গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক পার্থক্য, তাই ইতিহাসের নানা পর্যায়ের নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই দ্বিরূপতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাসের যেসব পর্যায়ে (কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে) পেশিশক্তি উৎপাদন ও সামাজিক প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেসব পর্যায়ে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান তৈরিতে ভূমিকা পালন করেছে পেশিশক্তির পার্থক্য। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন পেশি শক্তির গুরুত্ব কমে এসেছে, তখনও পূর্বে নির্ধারিত ঐসকল সামাজিক অবস্থান এবং সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রয়ে গেছে।

এখন একজন নারী-পুরুষের হাড় মাংসের পার্থক্য কতটুকু, কিভাবে তা গড়ে উঠে এবং কাজ করে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনের দিকে চোখ ফেরানো দরকার : - -

নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্য সম্পর্কে মানুষের কৌতুহল বহু প্রাচীন। সেজন্য পৌরাণিক ও বিভিন্ন উপাসনাধর্মীয় কাহিনীতে নারী-পুরুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বহু উপাখ্যান পাওয়া যায়। এরকম একটি প্রচলিত উপাখ্যান হচ্ছে, প্রথম মানব আদমের পাঁজরের হাড় (Rib) থেকে প্রথম মানবী 'হাওয়া'-কে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকর্তা। বাইবেল, কোরানসহ অন্যান্য উপাসনাগ্রন্থে রয়েছে। ফলে ব্যাপকভাবে উক্ত

ধর্মালম্বী মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, পুরুষের বুকের পাশে একটি হাড় কম এবং নারী একটি বেশি। বলা বাহুল্য, অ্যানাটমির তথ্য অনুসারে পাঁজরের হাড়ের সংখ্যার দিক থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যাই হোক, মানব অ্যানাটমিতে হাড়, মাংস, জয়েন্টগুলোকে একত্রে বলা হয় Musculo-Skeletal System। এগুলোকে একত্রে একটি সিস্টেমের মধ্যে ফেলা হয়, কারণ গঠন ও কাজের দিক দিয়ে এরা অবিচ্ছেদ্য এবং ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। হাড়, মাংসের আনুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, এগুলোর কোষগত গঠনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ যে কোষগুচ্ছর সমন্বয়ে নারীপুরুষের হাড় ও মাংস তৈরি হয় তা অভিন্ন পার্থক্য শুধু পরিমাণের।

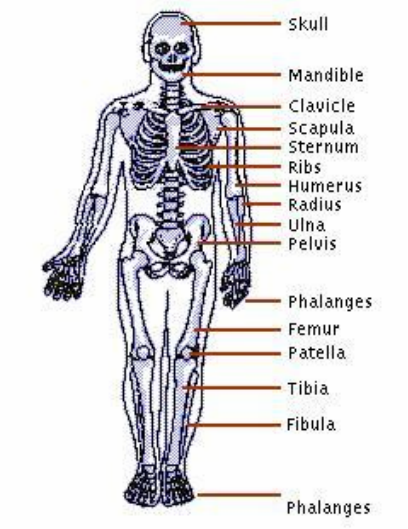

হাত পায়ের হাড় অর্থাৎ যেগুলোকে বলা হয় লং বোন (Long Bone), সেগুলোর ক্ষেত্রে মেয়েদের হাড় পুরুষের হাড়ের চেয়ে ছোট এবং দৈর্ঘের এর ব্যাস (Diameter) ছোট হয়ে থাকে। আট বছর বয়স থেকে ছেলে ও মেয়েদের মেরুদন্ডের গঠনের দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করে। এসময় থেকেই ছেলেদের কশেরুকাগুলোর (Backbone,Vertebra) আনুপার্শ্বিক ব্যাস (Transverse Diameter) মেয়েদের তুলনায় বাড়তে থাকে। মাথার হাড় ও খুলির ক্ষেত্রেও নারী ও পুরষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পূর্ণবয়স্ক নারীর খুলি পুরুষের তুলনায় হালকা এবং ধারণ ক্ষমতা মোটামোটি ১০% কম। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের কপালে চোখের উপরের অংশ উঁচু থাকে। মাথার চূড়া অপেক্ষাকৃত বসানো (Flat), পুরুষের তুলনায় নারীর কপাল বেশি খাড়া (Vertical) হয়, অর্থাৎ পুরুষের কপাল হেলানো হয়। পুরষের ম্যাক্সিলা (দাঁতের উপরের পাটি যে হাড়ের সাথে থাকে) এবং চোয়ালের হাড় (Mandible) মেয়েদের তুলনায় বড় হয়। অর্থাৎ মেয়েদের মধ্যে শিশুসুলভ বৈশিষ্টগুলো পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় থেকে যায়।

শিশুসুলভ দেহাবয়ব হবার প্রবণতা (Paedomorphic Tendency) মেয়েদের মধ্যে যেমন পুরুষের চেয়ে বেশি থাকে তেমনি প্রাইমেট বর্গের অন্য প্রাণিদের (গরিলা, শিমপাঞ্জি, বানর ইত্যাদি) তুলনায় সমগ্র মানব প্রজাতির মধ্যে (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) বেশি থাকে। অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে শিশু পর্যায় এবং পূর্ণবয়স্ক পর্যায়ের মধ্যে দৈহিক আকার ও আকৃতিগত পার্থক্য প্রাইমেট বর্গের অন্যান্য প্রাণিদের শিশু ও পূর্ণবয়স্ক প্রাণির দৈহিক আকার-আকৃতিগত পার্থক্যের চেয়ে কম। আবার পূর্ণবয়স্ক নারীদেহের মধ্যে এই পার্থক্য পুরুষের দেহের চেয়ে কম।

খুলি ছাড়াও নিতম্বদেশ বা পেলভিস (Pelvis)- এর হাড়ের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। নারীর পেলভিস পুরুষের চেয়ে চওড়া ও সামনের দিকে হেলানো থাকে। সেজন্য পূর্ণবয়স্ক নারীর নিতম্ব চওড়া এবং পেছন দিকে অপেক্ষাকৃত উঁচু হয়ে থাকে (Tilted Upwards)।

পেলভিসের সাথে উরুর হাড় বা ফিমার (Femur) এর কোণোটি (Angle) মেয়েদের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম। অর্থাৎ মেয়েদের উরুর হাড় ভেতরের দিকে চাপানো থাকে।

উপরের মানুষের কংকালের যৌনতা ভিত্তিক দ্বিরূপতা সম্পর্কের বর্ণনা থেকে নারী-পুরুষের কংকালের একটি অবয়ব আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। এটি হচ্ছে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদের কংকালে, খুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, মাথার চূড়া অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা, মুখমন্ডলের নিম্নাংশ ছোট। অর্থাৎ চোয়াল ও ম্যাক্সিলা ছোট। ধড়ের (Trunk) উপরের অংশ (কাঁধ ও বুক) সরু, নিতম্ব চওড়া। উরুর হাড় দু'টি ভেতরের দিকে বেশি চাপানো। হাত ও পায়ের হাড়গুলো পুরুষের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পুরু ও লম্বা।

কংকালের উপরেই মাংশপেশি লাগানো থাকে। কংকালের অবয়বের সাথে সমানুপাতিক হারে মাংশপেশি থাকে। সেজন্য দেখা যায় নারী-পুরুষের উভয়ের শরীরেই ৬৪০টি স্বেচ্ছাচালিত (Voluntary) মাংশপেশি হাড়সমূহের সাথে লাগানো থাকে এবং এগুলো শরীরের মোট ওজনের শতকরা ৪০ ভাগ। কিন্তু মেয়েদের শরীরের মাংস পুরুষের তুলনায় হাড়ের সমানুপাতিক হারে ছোট। কারণ, এই মাংসই হাড়গুলোকে নাড়িয়ে থাকে। যেমন, পুরুষের চোয়ালের হাড় মেয়েদের চেয়ে বড়, অতএব চোয়লের হাড়কে নাড়ানোর জন্য মাংসও অপেক্ষাকৃত বড় ও শক্তিশালী। একইভাবে হাত, পায়ের এবং ধড়ের মাংসগুলোর ক্ষেত্রেও পুরুষের শরীরের মাংস অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মাংসপেশির কোষগুলো গুণগতভাবে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন, পার্থক্য শুধু পরিমাণের। মাংসপেশির শক্তি বেশি বা কম হবার ক্ষেত্রে যে দু'টি বিষয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা হচ্ছে- (১) হরমোন ও (২) কায়িক পরিশ্রম। টেস্টেস্টোরন ও অন্যান্য অন্যাবলিক স্টেরয়েড হরমোন মাংসপেশির বৃদ্ধিকে বাড়িয়ে দেয়। এই হরমোনগুলোকে ঐতিহ্যগতভাবে "Androgen" অর্থাৎ পুরুষত্ব উৎপাদনকারী বলা হয়। এ হরমোনগুলো নারীদের দেহেও মাংসপেশীর গুণগতবৃদ্ধি ঘটায়; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক খেলোয়াড় মাংসের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এই হরমোন নিয়ে থাকেন, যা আন্তর্জাতিক খেলাধুলা অঙ্গনে নিষিদ্ধ।

জন্মের সময় ছেলে ও মেয়ে শিশুর হাড় ও মাংসের উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য থাকে না। বয়ঃসন্ধির সময় থেকে ছেলেদের শরীরে টেস্টেস্টরণ (Testosterone) ও মেয়েদের শরীরে ইস্ট্রোজেন (Estrogen) হরমোনের প্রভাবে পরিবর্তন শুরু হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক নারী ও পুরুষের মাংসের শক্তির পার্থক্য ১০-১৪% এর মধ্যে। সবচেয়ে ভালো নারী ও পুরুষ খেলোয়ারের মধ্যে (অর্থাৎ যারা খুব বেশি পরিশ্রম করেন) তুলনা করে দেখা গেছে এই পার্থক্য ১৩% এর মতো। **তবে নারীদের গড় শক্তিমত্তা ও নৈপুণ্য পুরুষ খেলোয়ারদের চেয়ে কম হলেও সাধারণ পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যে মাংসের শক্তির যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা সত্ত্বেও কোনো মেয়ের পক্ষে শরীর চর্চা দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে, তার শারীরিক শক্তিকে গড় পুরুষের সমান বা তার চেয়ে বেশি পর্যায়ে নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়**। মাংসপেশির একটি ধর্ম হলো, যতো একে খাটানো বা ব্যবহার করা যাবে ততই সে হয়ে উঠবে শক্তিময়, দক্ষ, কৌশলী। আর না ব্যবহার করলে ঘটবে, এর উল্টোটা। তাই বলা যায়, ছেলেবেলা থেকে শরীর চর্চার ঘাটতি মেয়েদের মাংসপেশীকে দুর্বল করে তোলে, নারীর দূর্বলতার ধারণতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। অতএব মাংসপেশির ঘাটতি নয়, অংশগ্রহনের ঘাটতিই নারীদের পিছিয়ে থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলা যায়। হাড় মাংসের শক্তি এমনকি গঠনও অনেক ক্ষেত্রেই জীবন যাপন পদ্ধতি এবং সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। নিয়মিত কঠোর কায়িক পরিশ্রম করেন এমন নারীদের হাত-পায়ের মাংস যারা কায়িক পরিশ্রম করেন না এমন পুরুষের চেয়ে সুগঠিত হয়ে থাকে।

তবে শুধু হাড় ও মাংসের হিসেব করলেই নারী-পুরুষের শক্তি পার্থক্যের জীবতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। জীবজগত ও সমগ্র জৈবনিক প্রকৃয়ার কিছু বিষয় এখানে অবশ্যই বিবেচ্য। যেমন : মানুষসহ প্রায় সব স্তন্যপায়ী প্রাণির ক্ষেত্রেই প্রজননের জন্য পুরুষ প্রাণির ক্ষেত্রে নারী প্রাণিকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়। সন্তান ধারণ, সন্তান প্রসব এবং লালন-পালনে নারী প্রাণিকে এমন একটি কষ্টকর চক্রে আবদ্ধ করে যে, তার জীবনীশক্তির অনেকটাই নিঃশ্বেষ হয়ে যায়। **সিমোন দ্য বোভেয়ারের ভাষায় বলা যায়, "প্রজাতি আশ্রয় নেয় স্ত্রী জাতির মধ্যে, তার স্বতন্ত্র জীবনের প্রায় সবটাই শুষে নেয়; ..... একটা পরিণত বয়স্ক প্রাণির মধ্যে নিষিক্ত ডিমের বিকাশই স্ত্রী জাতির পক্ষে একটা সর্বাত্মক কাজ হয়ে ওঠে। যৌন সংস্রব একটা অবিরাম প্রকৃয়া এবং এটা এমন একটা প্রকৃয়া যা পুরুষের সামান্যই জীবনী শক্তি ছিনিয়ে নেয়।**" তাছাড়া সকল স্তন্যপায়ীদের (গাভী, ঘোড়া, খরগোশ, ছাগল ইত্যাদি) মধ্যে মানুষের ক্ষেত্রে সন্তান ধারণ ও প্রসব সবচেয়ে কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক এবং প্রসব যন্ত্রণার সময় স্ত্রী প্রাণি জাতির মধ্যে মানবীকে সবচেয়ে বেশি ভঙ্গুর ও ভুক্তভোগী মনে হয়। ফলে এই প্রজনন প্রকৃয়ার দ্বারা মানবী কাহিল হয় সবচেয়ে বেশি এবং পুরুষের সাথে তার শক্তিমত্তার পার্থক্য হয় গভীরতর। ফলে সন্তান উৎপাদন, সন্তান লালন-পালন এবং প্রজনন সংক্রান্ত জটিলতা নারীকে সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ উদ্যমে অংশ নিতে বাধা দেয় এবং এ ব্যাপারগুলো নারীর উদ্যম ও শক্তির বিকাশে প্রতিবন্ধক।

অর্থাৎ গড়ে ১২% কম শক্তির মানুষটি আরও শক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে প্রজনন প্রকৃয়ার তার জীবনী শক্তির অনেকটা নিঃশেষ করে। এর ফলে তার জীবন প্রনালির মধ্যে দৈহিক পরিশ্রমের পরিমাণও আরও কমে যায়। যার পরিনাম হয় মাংসপেশির শক্তি আরও কমে যাওয়া এবং দুরূহ পরিশ্রমের কাজে নারীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া।

মানুষের হাড় ও মাংসের সবচেয়ে অনন্য ও বিস্ময়কর অবদান হচ্ছে শ্রম; শ্রমের সাথে ক্রমাগত অভিযোজন, প্রাণিকুলে মানুষের হাড় ও মাংসকে করেছে অনন্য। এ কথা খুব স্পষ্ট করে সর্বপ্রথম বলেছিলেন ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস তার "**মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা**" শীর্ষক প্রবন্ধে। এঙ্গেলসের ভাষায়, "সমস্ত মানবিক জীবনের মূলগত শর্ত হলো শ্রম।" মানুষের ইতিহাসের দিকে আমরা দেখতে পাবো, দুই লিঙ্গের সদস্যদের হাড়-মাংসের পরিমাণ নয় বরং শ্রমের ক্ষেত্র এগুলোর ভূমিকা বিভিন্ন সময়ে নারী-পুরুষের অবস্থান ও মর্যাদা নির্ণয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তবে শক্তিমত্তার পার্থক্যের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা হয়েছে ভিন্ন। মানব ইতিহাসের কোন পর্যায়ে নারী হীন ও অধস্তন অবস্থানে এসেছে এবং শ্রম ও উৎপাদন প্রকৃয়ায় পুরুষ হয়েছে মুখ্য নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি নিয়ে পরবর্তী খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আমাদের এই মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ সময় ধরে অধিকাংশ মানুষের (অগ্রসর এবং অনগ্রসর) মধ্যে ধারণা ছিল জন্মগতই অধিকাংশ নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে কম এবং বুদ্ধিবৃত্তির উচ্চতম পর্যায়ে নারীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় । এই ধারণা আজকের একবিংশ শতাব্দীরও বৃহৎ অংশের মানুষও বিশ্বাস করে থাকেন (৪)। ঊনিশ শতকের বেশির ভাগ বিজ্ঞানীও মনে করতেন মেয়েরা জন্মগতভাবে পুরুষের চেয়ে কম বুদ্ধির হয়ে থাকে। মেয়েদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কই এর কারণ বলে এ সময়ের বিজ্ঞানীরা অনুমান করতেন। অনুমানের এ ধারণাকে পরীক্ষামূলক ভিত্তির উপর দাড় করানোর জন্য প্রথম পর্যায়ে যারা কাজ করেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন পল ব্রোকা (Paul Broca, 1824-1880)।

(Dr. Paul Broca)

উল্লেখ করা যায় যে, মানব মস্তিষ্কের অগ্রভাগের Broca's area 'র কথা সবাই জানেন। এই ফরাসী বিজ্ঞানীর নামেই মস্তিষ্কের ঐ অংশটির নামকরণ করা হয়েছে।

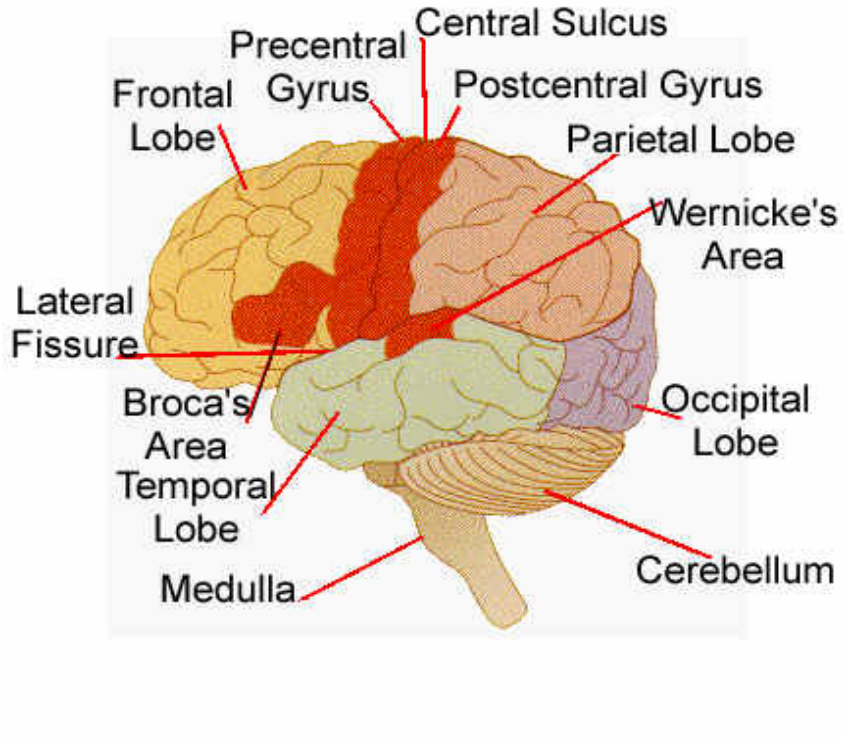

(মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত- ৫)

১৮৬০ এর দশকে প্যারিসের বিখ্যাত চিকিৎসক পল ব্রোকা বিভিন্ন হাসপাতালে Anthropometry বা মানব পরিমাপ (মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ করা এবং এসব পরিমাপ থেকে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা এই বিষয়ের মূল উপজীব্য) শাখায় গবেষণা করেন। তিনি বহু মস্তিষ্কের নির্ভুল পরিমাপ করে সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, "**সাধারণত মেয়েদের মস্তিষ্কের চেয়ে পুরুষের মস্তিষ্ক, সাধারণ প্রতিভার চেয়ে বিশিষ্ট প্রতিভার পুরুষের; নিম্নতর বর্ণের চেয়ে উচ্চতর বর্ণের মস্তিষ্কের আকার বড় হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের আয়তনের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির একটি লক্ষণীয় সম্পর্ক রয়েছে।**"

পল ব্রোকা প্যারিসের বিভিন্ন হাসপাতালগুলো থেকে ২৯২টি পুরুষের এবং ১৪০টি মেয়েদের মস্তিষ্ক

পরিমাপ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন : (ক) পুরুষের মস্তিষ্ক মেয়েদের তুলনায় বড় এবং সে কারণে জন্মগতভাবে বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে চৌকুষ। (খ) মানববিবর্তনের ধারায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মস্তিষ্ক, নারীর মস্তিষ্কের তুলনায় ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। ব্রোকার সংগৃহীত পুরুষের গড় মস্তিষ্কের ওজন ছিল ১৩২৫ গ্রাম এবং মেয়েদের গড় মস্তিষ্কের ওজন ছিল ১১৪৪ গ্রাম। পার্থক্য হচ্ছে ১৮১ গ্রাম বা ১৪%। ব্রোকার প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিত্তি ছিল মেয়েদের চেয়ে পুরুষের উচ্চতার আধিক্য। অর্থাৎ মস্তিষ্কের আয়তনের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার একটি সরল সম্পর্ক রয়েছে বলে ব্রোকা বিবেচনা করেছেন। এবং দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে, কঠিনতর জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য পুরুষের উন্নত মস্তিষ্কের প্রয়োজন, তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রকৃয়ায় এই বৈশিষ্ট্য পুরুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে।

পল ব্রোকার গবেষণামূলক সমন্বিতসিদ্ধান্তে কিছু ভুল রয়েছে। প্রথমত, মস্তিষ্কের নিরঙ্কুশ আয়তনের (Absolute Volume) সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা বিকাশের সরল সম্পর্ক রয়েছে বিবেচনা করেছেন, তাকে আধুনিক কালের গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় বা মোটা দাগের ভুল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, হাতির মস্তিষ্কের আয়তন মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে বেশি হলেও নিশ্চয়ই এ কথা বলা যাবে না হাতির বুদ্ধি মানুষের চেয়ে বেশি? শরীরের উচ্চতা, গঠন-কাঠামোর উপর মস্তিষ্কের আয়তন অনেকটা নির্ভর করে। তাছাড়া মস্তিষ্কের বড় একটি অংশ শরীরের মাংসপেশীগুলোকে নিয়ন্ত্রন করে এবং আরেকটি বড় অংশ শরীরের সংবেদন (Sensation) গ্রহন করে। তাই উচ্চতা ছাড়াও শরীরের মাংসের আয়তন এবং শরীরের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের পরিমাণও মস্তিষ্কের আয়তনকে প্রভাবিত করে। দুজন ব্যক্তি বা দু'টি প্রাণির মধ্যে আমরা যদি মস্তিষ্কের আয়তনের প্রকৃত ও কার্যকর আয়তন নিয়ে তুলনা করতে চাই, তবে এসব বিষয়গুলির কার্যকর ও প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা জরুরি। যা পল ব্রোকা করেননি। নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন প্রজাতির শরীরের ওজন ও মস্তিষ্কের ওজন উল্লেখ করা হলো (৬) -

প্রজাতি	**মস্তিষ্কের নিরঙ্কুশ ওজন (গ্রাম)**	**শরীরের ওজন (টন)**	**মস্তিষ্ক শরীরের ওজনের শতকরা কত অংশ**
মানুষ	১৩০০-১৪০০	০.০৭	২.১
বটলনোজ ডলফিন	১৬০০	০.১৭	০.৯৪
কিলার তিমি	৫৬২০	৬.০	০.০৯৪
এশিয় হাতি	৭৫০০	৫.০০	০.১৫
স্পার্ম তিমি	৭৮২০	৩৭.০	০.০২১
ফিন তিমি	৬৯৩০	৯০.০	০.০০০৪
নেংটি ইঁদুর	০.৪	০.০০০০১২	৩.২
গরু	৫০০	০.৫	০.১০

উপরের সারনী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র শরীরের আয়তন ও মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধির কারণেই একটি প্রাণীর বুদ্ধি বেশি হবে, সেটা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ হাতি, তিমি, ডলফিন, ইত্যাদি বৃহৎ আকৃতির প্রাণির মস্তিষ্কের নিরুঙ্কুশ আয়তন মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু ঐসব প্রাণির বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা মানুষের চেয়ে বেশি নয়। আবার মানুষের মধ্যেই মস্তিষ্কের আয়তনের স্বাভাবিকতার বিস্তৃতি (১০১৭-২০১২ গ্রাম) থেকে গড় ওজনের প্রায় ২৫% কম ওজন নিয়েই সর্বোচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এবং মস্তিষ্কের ওজনের প্রায় ৫০% বেশি ওজন হওয়া স্বত্তেও সেই

ব্যক্তির অতিমানবীয় কোনো ক্ষমতার উপস্থিতি ছিল না। উদাহরণ হিসেবে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করছি। ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ তুলনামূলক অ্যানাটমির জনক ব্যরন জর্জ দ্যা কুভিয়ারের মস্তিষ্কের ওজন ১৮৩০ গ্রাম, কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের মস্তিষ্কের ওজন ছিল ১২৮২ গ্রাম, বিজ্ঞানী ফ্রাঞ্জ জোসেফ -এর মস্তিষ্কের ওজন ১১৯৮ গ্রাম। ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনিভের মস্তিষ্কের ওজন ২০১৮ গ্রাম (সর্বকালের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে) এবং ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রান্স-এর মস্তিষ্কের ওজন ১০১৭ গ্রাম (প্রায় অর্ধেক ইভান তুর্গেনিভের থেকে)। এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি, **একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মানুষের সবচেয়ে ছোট আকারের মস্তিষ্কের মধ্যেও বুদ্ধিবৃত্তির সর্বোচ্চ বিকাশের সম্ভাবনা রয়ে গেছে**। তবে জন্মগতভাবে যারা ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা Microcephaly নিয়ে যারা জন্মান বা বুদ্ধি এবং অন্যান্য শারীরিক অক্ষমতার নিয়ে জন্মান; এরা এই স্বাভাবিকতার সীমার মধ্যে পড়েন না। এবার আরেকটি সারনী দেখুন (৭)। নিম্নের সারনী থেকে সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে, মস্তিষ্কের ওজন ও শরীরের ওজনের সরল তুলনা গ্রহণযোগ্য গাণিতিক সম্পর্ক নয় -

প্রজাতি	**ম/শ অনুপাত** (মস্তিকের ওজন ও শরীরের ওজনের অনুপাত)
ছোট পাখি	১/১২
মানুষ	১/৪০
নেংটি ইঁদুর	১/৪০
বিড়াল	১/১০০
কুকুর	১/১২৫
ব্যাঙ	১/১৭২
সিংহ	১/৫৫০
হাতি	১/৫৬০
ঘোড়া	১/৬০০
হাঙ্গর	১/২৪৯৬
জলহস্তি	১/২৭৮৯

উপরের সারনী থেকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে, (পল ব্রোকা'র তথ্য মেনে নিলে) ছোট পাখিদের বুদ্ধিমত্তা মানুষের চেয়ে অনেক অনেক উপরে এবং নেংটি ইঁদুর আর মানুষ এক পর্যায়ে!! আসলেই কি তাই?

যাই হোক, এখানে বিভিন্ন প্রজাতির মস্তিষ্কের আয়তনের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা সরাসরি প্রাসঙ্গিক নয়। তবে এটুকু বলা যায়, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণিদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের আয়তনের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার সম্পর্কের বিষয়টি সমাধান করার জন্য আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানীরা (এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নিউরোঅ্যানাটমিস্ট **Snell**) প্রত্যেক প্রজাতির জন্য Encephalization Quotient বা সংক্ষেপে EQ -এর প্রস্তাব করেছেন (EQ বলতে বুঝায় প্রাণিদের মস্তিষ্কের গড় বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার তুলনায় নির্দিষ্ট একটি প্রজাতির প্রাণিদের মস্তিষ্কের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা কতটুকু।)। এর ফর্মুলা হচ্ছে : $E = C \times S \times R$। এখানে E হলো মস্তিষ্কের আয়তন, C হলো Cephalization Factor, S হলো শরীরের ওজন এবং R হলো নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রাণিদের জন্য নির্ধারিত ধ্রুবক (স্তন্যপায়ী প্রাণিদের ক্ষেত্রে এই R এর মান হলো ০.৬ এর কাছাকাছি)। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন স্তন্যপায়ীদের Encephalization Quotient হচ্ছে (৮) ; মানুষ- ৭.৪৪, ডলফিন- ৫.৩১, শিম্পাঞ্জি- ২.৪৯, রেসাস বানর- ২.০৯, হাতি- ১.৮৭, তিমি- ১.৭৬, কুকুর- ১.১৭, বিড়াল- ১.০০, ঘোড়া- ০.৮৬, ভেড়া- ০.৮১, নেংটি ইঁদুর- ০.৫, ইঁদুর- ০.৪, খরগোশ- ০.৪। মানুষের EQ ৭.৪৪ দ্বারা

নির্দেশ করে যে, স্তন্যপায়ী প্রাণিদের গড় বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় মানুষ ৭.৪৪ গুন বেশি বুদ্ধিমান।

ব্রোকার দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে যে জন্মগত ক্ষমতা এবং আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শিক্ষাদীক্ষা উভয়ের ভূমিকা আছে, সেটি বিবেচনা না করা। সহজ সরল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে- মেয়েদের বুদ্ধি কম, তাই তাদের মস্তিষ্ক ছোট। মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে জন্মগত ও অর্জিত (শিক্ষা, অভিজ্ঞতা), দুধরণেরই বৈশিষ্ট্যেরই ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এই অর্জিত বৈশিষ্ট্য মেয়েদের ক্ষেত্রে তেমন বিকাশ লাভ করে না কারণ আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে মেয়েদেরকে বিকশিত হবার কম সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চর্চা, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে, বলা যায় পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আর এই পিছিয়ে থাকাকে শুধুমাত্র জৈবিক কারণ বা জন্মগত ত্রুটি বলে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত বড় ভুল। আমাদের জন্মের পর থেকেই সমাজ-পরিবেশই নির্ধারণ করে দেয় আমাদের বিকাশ কী রকম হবে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হবে, আমাদের আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, রুচিবোধ, চিন্তারধরণ ইত্যাদি আমরা পরিবেশ থেকে লাভ করে থাকি অনেকাংশেই। যে পাখিকে ছোট বেলা থেকেই ডানা বেঁধে রাখার কারণে উড়তে শেখেনি, তার জন্মগতভাবে উড়ার ক্ষমতা নেই, তা বলা যাবে কি? উপযুক্ত পরিবেশ পেলে যে নারীদের মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তার জ্বলন্ত প্রমান হচ্ছেন মেরি কুরি। পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র বিজ্ঞানী, যিনি পদার্থ বিজ্ঞানে (১৯০৩) এবং রসায়নে (১৯১১) নোবেল পুরুষ্কার লাভ করেছেন দু'বার।

এখন যে প্রশ্ন উঠে আসে তা হলো, নারী-পুরুষের মস্তিষ্কের কী কোনো পার্থক্য নেই? এপ্রসঙ্গে বলা যায় আধুনিক স্নায়ু বিজ্ঞানের কল্যানে (CT Scan, MRI (magnatic resonance imaging), PET (Positron emiting tomography), Brain topographic EEG, PONS (Profiles of neurological Sensitivity) ইত্যাদি (৯)) নারী-পুরুষের মস্তিষ্কের বেশ কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পার্থক্যগুলোর কারণে নারী-পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তির ধরণ এবং প্রবণতার পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে বলে স্নায়ুবিজ্ঞানীদের ধারণা। যেসব বিষয়ে মেয়েদের উৎকর্ষতা দেখা যায়, তা হচ্ছে - (১) মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, (২) বাচনিক ভাষার দক্ষতায়, (৩) আবেগ অনুভূতি একাগ্রতায়, (৪) শৈল্পিক প্রকাশের ক্ষেত্রে, (৫) নান্দনিক মূল্যায়ন ইত্যাদি এবং পুরুষের মধ্যে যে সকল বিষয়ে উৎকর্ষতা রয়েছে, তা হচ্ছে - (১) স্বাধীনতাবোধ, (২) কর্তৃত্ব, (৩) স্থান সম্পর্কিত ধারণা, (৫) গাণিতিক দক্ষতা ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে কতটা জৈবিক বংশগতির ধারায় এবং কতটা সামাজিক-পরিবেশের প্রভাবে বিকাশ ঘটে থাকে তা গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার। মানব বিবর্তনের ধারায় নারী-পুরুষের মস্তিষ্কের এই আলাদা বৈশিষ্ট্য অর্জন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রকৃয়ায় নির্বাচন হয়েছিল বলে জীববিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সেই বৈশিষ্ট্যই নির্বাচিত হয় যে, যা ঐ প্রাণীর টিকে থাকার জন্য সুবিধাজনক।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, (১) নারী-পুরুষের শক্তিমত্তার পার্থক্য স্থির বা নির্দিষ্ট কিছু নয়। (২) মস্তিষ্কের নিরঙ্কুশ আয়তনের সঙ্গে প্রাণির বুদ্ধিমত্তার কোনো সম্পর্ক নেই। (৩) শরীরের আকার, উচ্চতা, পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, মাংসের পরিমানের সাথে তুলনামূলকভাবে বিচার করলেই মস্তিষ্কের আয়তনের সাথে বুদ্ধিমত্তার একটি কার্যকর সম্পর্ক পাওয়া যায়। (৪) নারী-পুরুষের মস্তিষ্কের উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। (৫) নারী-পুরুষের মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যপ্রনালীর মধ্যে অল্প কিছু পার্থক্য আছে তবে উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা ও আগ্রহ যে কোনো লিঙ্গের মানুষকে যেকোনো বিষয়ে চৌকুষ করে তুলতে পারে।

.....ক্রমশ.....

তথ্যসূত্র :-

(১) হুমায়ুন আজাদ : নারী; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০। তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী-২০০১। পৃষ্ঠা : ১৭৭-১৮৬।

(২) চিত্রগুলি **http://web.jjay.cuny.edu/~acarpi/NSC/14-anatomy.htm** থেকে সংগৃহীত।

(৩) বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ : বিজ্ঞান চেতনা; দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি- মার্চ ২০০৫। পৃষ্ঠা : ২৬- ৫৬।

(৪) বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ : বিজ্ঞান চেতনা; নবম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় বর্ষ, জানুয়ারি-জুন ২০০৪। পৃষ্ঠা : ৩৩-৪৮।

(৫) চিত্রটি **http://www.ling.udel.edu/colin/courses/ling101_f99/lecture24.html** অংশ থেকে সংগৃহীত।

(৬) **http://www.enchantedlearning.com/subjects/anatomy/brain/Animals.shtml** এবং : বিজ্ঞান চেতনা; নবম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় বর্ষ, জানুয়ারি-জুন ২০০৪। পৃষ্ঠা : ৩৬ থেকে সংগৃহীত।

(৭) **http://serendip.brynmawr.edu/bb/kinser/Int3.html** থেকে সংগৃহীত।

(৮) **http://serendip.brynmawr.edu/bb/kinser/Int3.html** থেকে সংগৃহীত।

(৯) **http://www.cerebromente.org.br/n11/mente/eisntein/cerebro-homens.html** ।

****

যোগাযোগ : **ananta_atheist@yahoo.com**